দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে সমকালীনতা:

চল্লিশ ও তৎপরবর্তী কথাবয়নের প্রেক্ষিত–

একটি পর্যালোচনা

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে সমকালীনতা: চল্লিশ ও তৎপরবর্তী কথাবয়নের প্রেক্ষিত– একটি পর্যালোচনা

আধুনিক পৃথিবীর মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা-বেদনার সাহিত্যরূপ হচ্ছে উপন্যাস। উপন্যাসে আমরা পাই মানুষের একটি মোটামুটি সামগ্রিক চেহারা, তার অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের মিলিত রূপ, এ দুয়ের টানাপোড়েন। সত্যেন্দ্রনাথ রায় 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা' গ্রন্থে উপন্যাস এর সংরূপ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন "উপন্যাসে পাই সমাজমধ্যগত মানুষের জীবনযাপনের একটা যথাসম্ভব বাস্তব চেহারা। একলা-মানুষ নয়; নিঃসঙ্গ মানুষ নয়, উপন্যাসে পাই ঘরোয়া মানুষকে, পারিবারিক মানুষকে, সামাজিক মানুষকে —নানা দিকের সম্পর্কজালের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা জীবনের বহু বিচিত্র রূপের সমগ্রতাকে । মানুষ যখন একইসঙ্গে আত্মসচেতন এবং সমাজ-সচেতন, নিজের ব্যক্তিসত্তা এবং নিজের বাস্তব পরিবেশ একইসঙ্গে যখন মানুষকে উত্তেজিত করে তখনি আসে উপন্যাসের কাল।"[১]

সাধারণ ভাবে এ কথা বলা যায় যে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে প্রধান লক্ষ্যই ছিল দেবমহিমা কীর্তন। সেখানে মানুষের গোষ্ঠী পরিচয়ই ছিল প্রধান – ব্যাক্তিপরিচয় ছিল মূল্যহীন। অন্যপক্ষে আধুনিক কালের প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিচেতনা, ব্যক্তির প্রাতিস্বিক মূল্যের স্বীকৃতি। ফলত আধুনিক কালের সাহিত্য-ব্যাক্তিকেই দেখতে চায় নানা দিক থেকে। যথার্থ দ্যাখা হচ্ছে পটও পটধৃত জীবনকে অন্বিত করে দেখা। উপন্যাসের লক্ষ্য দেবমহিমা নয়, মানবজীবনের যাপনের সত্য। বাস্তব জগৎ-জীবনের অধ্যাস রচনার শক্তিই উপন্যাসের শিল্প সাফল্যের চাবিকাঠি।[২] এর জন্য যে বাস্তবমুখী জীবনদৃষ্টির দরকার, আগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সে জীবনদৃষ্টি সম্ভব ছিল না। এই বাস্তবমুখী দৃষ্টির একটা মৃদু আভাস পাওয়া যায় মোগল

সামন্ততন্ত্রের চরম অবহ্লয়ের কালের, ভারতচন্দ্রের কাব্যে অথবা গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্রপুরাণে'। শুধু ভাঙনে, শুধু জীর্ণতায় এর থেকে বেশি সম্ভব নয়। ভাঙনের পাশাপাশি কিছু নতুন ইতিবাচক পরিবর্তনও দরকার। সেইটে ঘটলো পলাশীর যুদ্ধের পর, বিশেষ করে, যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজ কুঠি ঘিরে মুৎসুদ্দি বেনিয়ানেরা নতুন সমাজের কর্তা। তাঁরা যেকোন বর্ণের লোক তা ক্রমেই অবান্তর হয়ে পড়েছে। বিত্তের যেমন, নতুন শহর-বন্দরে বৃত্তির হ্লেত্রেও ঠিক সেরকমই ঘটেছে। যে কোনো বর্ণের লোক বিত্তের আকর্ষণে নিজের সুবিধা-সুযোগ মতো বৃত্তি গ্রহণ করেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ভূমিস্বত্বের হ্লেত্রেও বর্ণের গুরুত্ব অল্প সময়ের মধ্যে বাতিল হয়ে গিয়েছে। মানুষ ব্যক্তিস্বরূপে এবং অবশ্য শ্রেণিস্বরূপে পরিচয়ের নতুন নিরিখ গড়ে তুলেছে।

ভারতে ইংরেজ-অধিকার কায়েম হওয়ার ফলে, ইংরেজের সৃষ্ট ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার কারণে, প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মাঝারি মাপের শোষণে এবং পরে বৃহৎ পুঁজির অর্থাৎ ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল পুঁজির বড়ো-মাপের শোষণের প্রক্রিয়ায় ভারতের অল্পবিস্তর স্বয়ংসম্পূর্ণ স্থিতিশীল পরিবারকেন্দ্রিক গ্রামসমাজে ভিতরে ভিতরে গভীর পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তাঁত ও চরকার ধ্বংস, গ্রামের ঘরে-ঘরে ছোটবড়ো যে কুটির শিল্প, পারিবারিক শিল্প ছিল, তার বিনষ্টি মধ্যযুগীয় গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনীতির ভিতকে ভেঙে দিয়ে যে নতুন ধরনের অর্থনীতি গড়ে তুলল, তারই নাম ঔপনিবেশিক অর্থনীতি। এই ঔপনিবেশিক অর্থনীতি যন্ত্রের সাহায্যেই পুঁজিবাদ পরাধীন দেশে তার শোষণকে সক্রিয় রাখে। বঙ্গদেশে সেদিন শহুরে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ইংরেজের এই অর্থনৈতিক-যন্ত্রের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল।[৩]

ধনতন্ত্রের এই ঔপনিবেশিক অর্থনীতি সেদিন প্রথম বাংলাদেশে তারপর গোটা ভারতে একটা নতুন পালার সূচনা করে দিয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ নিজের স্বার্থেই এই অর্থনৈতিক, সামাজিক বিপ-বের সাহায্যে ভারতের শিল্পায়ন বা দেশি পুঁজিবাদের পূর্ণ বিকাশ হয়ে দেয় নি।

দেশি পুঁজি প্রবল হয়ে ক্রমে ইংরেজের পুঁজির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠুক, এটা ইংরাজ প্রভুর কখনোই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। উপনিবেশে শিল্পায়ন ঘটবে আবার ঘটবেও না, এই স্ববিরোধী প্রয়াসই ঔপনিবেশিক প্রভুর স্বাভাবিক প্রয়াস।

এই অসম্পূর্ণ শিল্পায়নের ফলেই এদেশে যেভাবে এবং যত দ্রুত মধ্যযুগের অবসান হতে পারত, তা ঘটে নি; আধুনিক যুগ যেভাবে এবং যত তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠিত হতে পারত, তা হয়নি। যা ঘটেছে তা একটি জগাখিচুড়ি জাতীয় ব্যাপার। একদিকে অনেক মধ্যযুগীয় বিধিব্যবস্থা, অনেক আচরণ, অনেক সংস্কার, তাৎপর্যহারা অনেক পুরনো ভাবনা, উপযোগিতা-ভ্রষ্ট অনেক অন্ধ-অভ্যাস সমাজদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিকারের দূর্গ রচনা করে রেখেছে। অন্যদিক থেকে যদি দেখি তাহলে দেখতে পাব, নতুনের হ্লেত্রেও অনেক বিকৃতির সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক বিপ্-ব পূর্ণাঙ্গ হলে, সার্থক হলে, যুগপোযোগী ব্যবস্থাদি যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত, নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজের গভীরে যেভাবে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারত, তা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে এ বিষয়ে সঠিক দিশা নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর মতে সমাজের সমস্ত অত্যাবশ্যক হিতকর ব্যাপার সমাজে স্বাভাবিক নিয়মে ঘটানো উচিত, তার জন্য বাইরের শক্তির প্রয়োজন নেই। ভারত প্রাচীনকাল থেকে রাজশক্তির ওপর নির্ভর না থেকে নিজের আত্মশক্তির ওপর ভরসা করে এসেছে এবং নিজের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিজেই করে এসেছে। কিন্তু ইংরেজ শক্তির প্রভাব বিস্তারের ফলে সমাজের সকল হ্লেত্রে ইংরেজের প্রভুত্ব বিস্তৃত হচ্ছে যা রবীন্দ্রনাথের মতে ছিল অনভিপ্রেত। আমাদের দেশে রাজশক্তি ছিল বটে। রাজা তাঁর কার্য যেমন যুদ্ধ, শিকার, বা আমোদ প্রমোদে দিন কাটান। সে জন্য ধর্মের বিচারে তিনি দায়ী হবেন— কিন্তু জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁর ওপর একান্ত নির্ভর করে বসে থাকতেন না। সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্যরূপে বিচিত্র রূপে ভাগ করা ছিল। তাঁর মতে "ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন

স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেখানেই দেশের মর্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয় তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এইজন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপন করি নাই কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বোতভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিহ্লাদান হইতে সাধারণকে ধর্মশিহ্লাদান এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে স্টেটের উপর নির্ভর— আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্মব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত— এই জন্য ইংরেজ স্টেটকে বাঁচইলেই বাঁচে, আমরা ধর্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেও বাঁচিয়া যাই।”[৪]

এজন্য “আমাদের দেশে সরকার বাহদুর সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে কর্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্মসম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিবে। অথচ এই অকর্মণ্যতা আমাদের দেশের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। আমরা নানা জাতির, নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত কাজ আপনি নির্বাহ করিয়া আসিয়াছে। হ্লুদ্র বৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অন্য কাহাকেও হস্তহ্লেপ করিতে দেয় নাই। সেইজন্য রাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায় গ্রহণ করেন নাই।[৫]

বিদেশী পুঁজিবাদের সর্বনাশা করালগ্রাসের থেকে মুক্তির উপায় তিনি বলে দেন এইভাবে “মনে করো প্রোভিনশ্যাল কন্‌ফারেন্সকে যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার কাজে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কী করিতাম? তাহা হইলে আমরা বিলাতি ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশী ধরণের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রা -গান -আমোদ -আহ্লাদে

দেশের লোক দূরদূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শণী হইত। সেখানে ভালো কথক-কীর্তন-গায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক-লণ্ঠন প্রভৃতির সাহয্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইতো এবং আমাদের যাহা- কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা কিছু সুখদুঃখের পরামর্শ আছে, তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলা ভাষায় আলোচনা করা যাইত।"[৬]

এই স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ ভেঙেছিল ঔপনিবেশিক যুগে এসে। রবীন্দ্রনাথ কাঙ্ক্ষিত এই সামাজিক জাগরণ পরিপূর্ণভাবে ঘটানো যায় নি। নতুন ভাবনাচিন্তার মধ্যে নানা রকম জটিলতা এসে গিয়েছে। পরাধীন দেশে একদা উন্নত অধুনা উপনিবেশে পরিণত সমাজের নব জাগরণ কখনোই সুস্থ ও সবলভাবে হতে পারে না। ঐতিহ্য আর আধুনিকতার দ্বৈততা সব নবজাগরণেই স্বাভাবিক, কিন্তু উপনিবেশে ঐতিহ্য- প্রীতির ক্ষেত্রে যেমন, আধুনিকতার আকর্ষণের ক্ষেত্রেও তেমনি, দুই ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্য ও বিকার জড়িয়ে যায়, শুধু দোটানা নয়, দু-দিকের টানের মধ্যেই জটিলতার গ্রন্থি পড়ে যায়। উনিশ শতকের জাগরণে এটাই ঘটেছে। তার প্রাচ্যতা বা ঐতিহ্যমুখী টানও সরল নয়, তার আধুনিকতা বা নবযুগ-অভিমুখী টান, তাও সরল নয়।

বাঙালির উনিশ শতকীয় নবজাগরণের এই দোটানা এবং জটিলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল সান্নিধ্য ও অভিঘাত- এবং ভিতরে-ভিতরে তারই মধ্য দিয়ে নবযুগের সংযোগ ও সংঘর্ষ- স্বাভাবিক ভাবেই সেদিনের সহসা সচেতন বাঙালির মধ্যে একই সঙ্গে একদিকে যেমন তার যুগচেতনা জাগিয়ে তুলেছে, অন্যদিকে তেমনি তার ঐতিহ্যচেতনা এবং আত্মতার বোধও জাগিয়ে তুলেছে। একদিকে যেমন তার নতুনের প্রতি পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা জেগে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গেই অবধারিতভাবে তার প্রাচ্যাভিমানও জাগ্রত হয়ে উঠেছে। নিজের বিচলিত আত্মতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা, নিজেদের বিনষ্টপ্রায়

ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের প্রয়াস সুস্থ এবং স্বাভাবিক। কিন্তু এই পথে এরই সঙ্গে মিশে গিয়েছে অন্ধ অহমিকা, ইতিহাস বিমুখ প্রতিক্রিয়াশীলতাও। ইতিহাসমুখিতা, যুগসচেতনতা জীবনের স্বাভাবিক অগ্রগতির বাহন। কিন্তু আধুনিতকতার নামে তারই সঙ্গে এসে মিশেছে অন্ধ পাশ্চাত্যানুকরণ, অর্থহীন বিলেতিয়ানার ফ্যাশন, বিলেতি জীবনচর্যার নির্বিচার অনুকরণের চেষ্টা, প্রচুর পোশাকে সজ্জিত হবার বাসনা, অনতি-প্রচ্ছন্ন দাস-মনোভাব, আষ্টেপৃষ্টে- জড়ানো হীনমন্যতা। ঔপনিবেশিক মানসের স্বাভাবিক দ্বৈততার এই বিপরীতমুখী টানকে, এই টানের দুইদিকেই যে স্বাস্থ্য আর বিকারের অদ্ভুত সহাবস্থান - এই টেনশনের ভেতর থেকেই আধুনিক উপন্যাসের জন্মসম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই পর্বান্তরের পর্বেই জন্ম নিয়েছে যে মধ্যশ্রেনি, তার আত্ম অবলোকনের ও আত্মপ্রসারের প্রতিবেদন হল উপন্যাস।

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি বড় ফল হল ভূমির উপর নির্ভরশীল নানাস্তরের এবং ছোট-বড়-মাঝারি নানা মাপের মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি। ভূস্বামী হিসেবে সবার উপরে জমিদার, আর উৎপাদক হিসেবে সবার নিচে চাষি রায়ত, মাঝখানের তালুকদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, জোতদার, ঠিকাদার নানারকমের ইজারাদার লাখেরাজ ভোগী, ট্রাস্ট সম্পত্তির স্বত্বভোগী প্রমুখ সকলেই ভূমিরাজস্বের ভাগীদার এবং কৃষকের শোষণকারী পরশ্রমভোগী। অনেকক্ষেত্রে এঁদেরই কেউ কেউ আবার মহাজনও। দিনে দিনে ভূমি যতই বিভক্ত হয়ে স্বল্পায়তন হতে লাগল এবং অন্যদিকে নগরের বৃত্তি ও চাকুরির আকর্ষণ যতই বাড়তে লাগল, ততই অনেকেই শহরবাসী হতে লাগলেন। এবং আগের তুলনায় যুগ-সচেতন, ইতিহাস অভিমুখী এবং প্রগতিশীল হয়ে উঠতে লাগলো।[৭]

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় 'বাংলা কথা সাহিত্য জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে বাংলা উপন্যাসের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন "বাংলা 'সাধু' গদ্য গড়ে উঠেছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে। কিন্তু তাঁদের চালনা করেছিলেন উইলিয়ম কেরী। ইংরেজী গদ্যের আদলে

এই 'সাধু' গদ্য গড়ে উঠেছিল। তা পূর্বেকার চলিত ভাষায় স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী নয়। তেমনি বাংলা উপন্যাস গড়ে উঠেছিল ইংরেজি উপন্যাসের (আঠারো শতকের) আদলে। তা বাংলা কিস্‌সা কাহিনি, উপকথা, রূপকথা, কথকতার আদলে গড়ে ওঠে নি।"[৮]

বাংলা সাহিত্যে অভিব্যক্ত উনিশ শতকীয় আধুনিকতার চরিত্র উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে তপোধীর ভট্টাচার্য 'আধুনিকতা পর্ব থেকে পর্বান্তর' গ্রন্থে লিখেছেন "ব্যবহারিক জীবনে বৈষয়িক স্বার্থকে অপ্রতিহত রাখার প্রয়োজনেই প্রতীচ্য নির্ভরতা কার্যত হয়ে উঠল প্রতীচ্য সর্বস্বতা। বণিকের মানদণ্ডকে শাসকের রাজদণ্ডে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে নির্বিঘ্ন ও ত্বরান্বিত করার জন্যে যে সব সুযোগসন্ধানীরা নিজেদের ব্যবহৃত হতে দিয়েছিলেন, তাঁদেরই পরবর্তী প্রজন্মগুলি শাসকের নেকনজরে থাকার অভিপ্রায়ে সাংস্কৃতিক শিকড় ছিন্ন করে ইউরোপকেন্দ্রিক মানসিকতায় আশ্রয় নিলেন। এই পরগাছাবৃত্তির ভাবাদর্শগত কাঠামোটি ক্রমশ আধুনিকতার ধারক বলে চিহ্নিত ও গৃহীত হয়েছে। ইতিহাসের নিজস্ব ধারাবাহিকতাকে প্রত্যাখান করে নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়ার আত্মবিনাশী সম্ভাবনাকে যে নিরঙ্কুশ করে তোলা হচ্ছে সেদিকে কারো লহ্ল্য ছিল না"।[৯]

বাংলার ঐতিহ্য থেকে উপন্যাস সরে এসেছিল। উপন্যাসের আঙ্গিক ও বিষয় নির্বাচনের হ্লেত্রে ইউরোপীয় ছাঁচকেই বঙ্কিম গ্রহণ করেছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রখ্যাত সমালোচক দেবেশ রায় উল্লেখ করেছেন যে "বাংলা উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তৈরি হয়েছিল ইংরেজি নভেলের একটি বিশেষ ধরনকে আদর্শ করে। তারপর থেকে সেই ধরনটিই বাংলা উপন্যাসের একমাত্র আদর্শ হয়ে আছে। ফলে বাংলা উপন্যাস তার গত সোয়াশ বছরের বেশি সময়ের ইতিহাসে বাংলা আখ্যানসাহিত্যের সমৃদ্ধ প্রাক-আধুনিক ধারা থেকে কোনো পুষ্টিই সংগ্রহ করতে পারে নি। অথচ আমাদের আখ্যান সাহিত্যের এই ধারা অন্তত পহ্লে আঠারো শতকের শেষ বা এমনকী উনিশ শতকের শুরু পর্যন্ত ও বাংলা সাহিত্যের

অন্যতম প্রধান ধারা হিশেবে গ্রাহ্য ছিল।”[১০]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাস্তব কাহিনি প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। দেবমহিমাজ্ঞাপক রচনাগুলিতে সমকালীন সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের বাস্তব জীবনের ছবি দেখতে পাওয়া যায়, যা আধুনিক উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ও ভারতচন্দ্রের রচনাতে আমরা এর নিদর্শন পাই।

বঙ্কিমের উপন্যাসের পূর্বে ছয়শো বৎসরের মঙ্গলকাব্য আখ্যানকাব্যের কথকতার যে ধরন, তারই ধারাবাহিকতায় রচিত হয়েছে ভবানী চরণের ‘নববাবু বিলাস’ এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ কিংবা কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুঁতোম প্যাঁচার নক্সা।’ এই তিনখানি উপন্যাসে ‘বাবু’ চরিত্র এবং বাবু সৃষ্ট সমাজজীবন আলোচিত হয়েছে, নবপ্রতিষ্ঠিত কলকাতা নগরীর উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত আমোদ-উৎসবের অ-সভ্য দিনযাত্রা, দুরাচার, বেলেল্লাপনার সমালোচনায় মুখর হয়েছেন লেখকবৃন্দ। এ যেন মুকুন্দ-ভারতচন্দ্রের উত্তরাধিকার। যদিও লেখকেরা সমকালীন জীবনের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, প্রাণশক্তির প্রাচুর্য ও ভাঁড়ামির পর্যায়ভুক্ত অমার্জিত রসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু এই কথন দৃশ্যগুলির মধ্যে কোনো ব্যক্তিত্ব সমন্বিত চরিত্র নেই। দেশজ ঐতিহ্য অনুসারে নবযুগের আখ্যান রচনার যে নতুন শিল্পরূপের সন্ধান করেছিলেন টেঁকচাদ ও হুতোম, তা সমকালীন বাস্তবতার উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি ছাঁচকে গ্রহণ করতে গিয়ে লোকায়ত সমস্ত ঐতিহ্যের সঙ্গে যেমন সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, তেমনি সমকালীন সমাজ জীবন থেকেও মুখ ফিরিয়ে রোমান্স ইতিহাসে অতীতচারী হয়েছিলেন।

অথচ এই বঙ্কিমচন্দ্রই যখন প্রবন্ধ লিখছেন ‘সাম্য’, ‘বঙ্গদেশের কৃষক’ কিংবা ‘মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত’ তখন তিনি সমকালীন সমস্যা অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করছেন। প্রাবন্ধিক কৃষকদের কান্না শুনতে পাচ্ছেন। মুচিরামরা আক্রান্ত হচ্ছেন। অথচ তাঁর

উপন্যাসে কোথাও সমকালকে ধরে রাখছেন না। সমকাল থেকে তাঁর উপন্যাসকে তিনি সরিয়ে দিয়েছেন রোমান্স ইতিহাসে। সেখানে সমকালীন জীবন, ভূমিভিত্তিক শ্রেণিসমূহ কদাচিৎ উঠে আসছে , সেখানেও গল্প চলে যাচ্ছে ব্যক্তিগত প্রেম এবং সেই সূত্রে ধর্ম- পাপ-পূণ্যের খাতে। একই কথা বলা চলে Peasentry of Bengal এবং 'মাধবী কংকন' 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' এর রচয়িতা। রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পর্কেও।[১১]

২

বঙ্কিমন্দ্রের বিষবৃহ্ল, 'কৃষহ্লকান্তের উইলে' সমাজ সংসারের সমকালীনতার কিছু বাস্তব ছবি অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গড়ে ওঠা সামন্তবাদী মধ্যস্বত্বভোগী আমলাদের অত্যাচারে প্রজাবিদ্রোহের ইঙ্গিত থাকলেও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত প্রণয়ের খাতে আখ্যান ঝুঁকে পড়েছে। তেমনি রমেশচন্দ্রের 'সংসার'এবং 'সমাজ' উপন্যাসদুটিতে বিধবা বিবাহ এবং বহুবিবাহের সমস্যার বিষয়েই আলোচিত হয়েছে। সমকালীন সমাজ চিত্র উল্লেখিত উপন্যাস দুটিতে রয়েছে, যদিও উপন্যাস হিসেবে এগুলো উচ্চমানের হয় নি। এ প্রসঙ্গে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য। উপন্যাস রচনায় তারকনাথ, প্যারীচাঁদ, হুতোমের ধারাই অনুসরণ করেছেন। বাঙালির সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের ছবি এঁকেছেন তিনি 'স্বর্ণলতা'য়, কিন্তু সেকালের ঔপন্যাসিকেরা বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথেই হেঁটেছেন। মাটির গল্প সে যুগে প্রাধান্য পেল না। বাঙালির স্বজাত্যাভিমান তাকে অতীতচারী করে তুলেছিল।

এরপর এলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তিনিও প্রথম দুটি উপন্যাসে 'রাজর্ষি' ও 'বউঠাকুরাণীর হাট' এ, বঙ্কিম-প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। এরপর তিনি অনেকদিন উপন্যাস রচনা করেন নি। তারপর বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে তিনি লিখলেন 'চোখের বালি' উপন্যাস। ইতিহাস ও রোমান্সকে তিনি বর্জন করে সামাজিক বাস্তবতাকে রূপায়িত করলেন।

সমকালীন জীবন প্রবাহ থেকেই আহরণ করেছেন উপন্যাসের উপাদান। বিধবা বিনোদিনী, মহেন্দ্র, আশা, বিহারী প্রত্যেক চরিত্রের 'আঁতের কথা' উদ্‌ঘাটন করেছেন তিনি। ঘটনা পরম্পরার গ্রন্থনা ও বিশ্লেষণ নয়। চরিত্রের 'আঁতের কথা', বিশ্লেষণই উপন্যাসের লক্ষ্য তা তিনি বললেন। বিহারী ও বিনোদিনীর আত্মউদ্‌ঘাটন ও আত্ম-আবিষ্কারে বাংলা উপন্যাসের মোড় বদল হয়েছে। এর পরবর্তী উপন্যাস 'গোরা' একই সঙ্গে ভারত ভাবনার রূপায়ণ ও জীবনধর্মী কাহিনি। উনিশ শতকের হিন্দু মধ্যবিত্তের আচারনিষ্ঠার অন্তঃসারশূণ্যতা রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে পরিস্ফুট করেছেন। বাংলাদেশের সেই যুগ-সন্ধিক্ষণের বাঙালির ধর্ম বিষয়ে সনাতনপন্থী ও নব্যপন্থী, রক্ষণশীল ও সংস্কারবাদী – সকল মতের যুক্তি তর্ক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি উপন্যসের আধেয় হয়ে উঠেছে। গোরা রক্ষণশীল আচারধর্ম পালনের মধ্যেই ভারতবর্ষের ঐক্যের পথের সন্ধান করেছে। উনিশ শতকের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনে আচারপালন সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সারা উপন্যাসে গোরা চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। যে গোরা ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত, সেই একসময় ব্রাহ্ম পরেশবাবুকে তার গুরু বলে স্বীকার করে নেয়। গোরার এই দহনময় আত্মোপলব্ধির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে চরঘোষপুরের প্রসঙ্গ। ভারতসত্তার সন্ধানে গ্রামভ্রমণে বেরিয়ে গোরা একসময় পৌঁছেছে চরঘোষপুর গ্রামে। এখানে সে প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছে তার উপলব্ধির খণ্ডিত স্বরূপকে। চরের নীলের জমি নিয়ে প্রজাদের সঙ্গে নীলকুঠির প্রবাল বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। চরঘোষপুরের প্রজারা ফরু সর্দারের নেতৃত্বে রুখে দাঁড়িয়েছে সাহেবদের বিরুদ্ধে। ফরু সর্দারকে পুলিশ হাজতবন্দি করেছে। ফরুর বালকপুত্র তমিজকে লালনপালন করছে এক বৃদ্ধ নাপিত ও তার স্ত্রী। গোরার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুঘরে আতিথ্যগ্রহণ, কিন্তু মুসলমানস্পর্শদোষে নাপিতবাড়ির অন্নগ্রহণ করা সম্ভব হলো না। গোরা জানতে পারল এই গ্রামে অন্নজল গ্রহণ করতে হলে যেতে হবে নীলকুঠির কাছারি তহসিলদার ব্রাহ্মণ মাধব চাটুজ্জের বাড়িতে, যে তহসিলদার নিজে দারোগাকে ডেকে

এনে প্রজাদের উপর সীমাহীন অত্যাচার করাচ্ছে। গোরা ফিরে এল নাপিতের বাড়িতে। এখানে অন্নগ্রহণের আগে তার মনে হলো—"পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিস করিয়া ভারতবর্ষে আমরা এ কী-ভয়ঙ্কর অধর্ম করিতেছি।"[১২]

চরঘোষপুরের অভিজ্ঞতায় গোরার মোহভঙ্গ শুরু হয়েছে। নানা ঘটনার পর তাই উপন্যাসের শেষে সে বলেছে, চণ্ডালের ঘরেও তার অপবিত্রতার ভয় নেই। আজ ভারতবর্ষের সত্যরূপ তার সামনে উদঘাটিত হয়েছে। এ দেশ সকলের, ভারতবর্ষের দেবতাও কেবল হিন্দুর দেবতা নন। আজ লছমিয়ার হাতে জল খেতেও তার কোনো দ্বিধা নেই। শুচিতার প্রশ্ন তার কাছে অবান্তর হয়ে গেছে। লহ্নণীয় যে এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সেই সময়কার দ্বিধাবিভক্ত ভারতবর্ষের সঠিক রূপায়ণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটিও বিচারের অবকাশ রয়েছে, উপন্যাসের সমকালীনতার প্রশ্নে। নিখিলেশ বিমলা ও সন্দীপ এই তিনটি চরিত্রের অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বের সংকট এই উপন্যাসটির মূল কথা। তবুও এতে লেখকের সমকাল সচেতনতা ও যুগ-সচেতনতাই উপস্থিত। সেই সঙ্গে উপস্থিত চরিত্রের আত্মসমীহ্না। চরিত্র গুলি নিজের মুখোমুখি হয়েছে ,তাদের আত্মোপলব্ধি ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছে। সন্দীপ স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে যাওয়া বাক্-সর্বস্ব সমর্থক। বাক্যজাল বিস্তার করে শ্রোতাকে মুগ্ধ করতে চায় সে। তার বাক্যজালে হ্নণিকের তরে হলেও বিমলা মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু নিখিলেশ স্থিতধী। এই বাগাড়ম্বরের বা আন্দোলনের ফাঁকটুকু তার চোখে ধরা পড়েছে। তাই আন্দোলনের অসারতা সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ। আবেগের জোয়ারে সে ভেসে যেতে পারে নি। সে সমর্থন করতে পারে নি 'বিদেশি দ্রব্য বর্জন'কে । সে স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার ও বিদেশি দ্রব্য পোড়ানোর নীতিকে সমালোচনা করেছে। আসলে মানবিকতার দিক থেকে এই দ্বিধাহীন প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশি আন্দোলন অপেহ্নাকৃত অসংগঠিত ছিল, এর পেছনে দলীয় রাজনীতি খুব শক্তিশালী

ছিল না। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে এই আন্দোলনের সঙ্গে উৎসাহের সঙ্গে যুক্ত হলেও পরে তিনি নিজেকে সরিয়ে এনেছিলেন। এর বছর দশেক পরে এই আন্দোলনের দুর্বলতা ও বিপদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি লেখেন। সত্যেন্দ্রনাথ রায় উল্লেখ করেছেন যে "রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় এই আন্দোলনের প্রধান এক দূর্বলতা হল এর মধ্যবিত্ত সংকীর্ণতা। দেশকে বাদ দিয়ে দেশসেবার আস্ফালন। আর দ্বিতীয় দুর্বলতা হল দুর্বলতা না বলে বিপদ বলাই সঙ্গত— তা হল, সন্ত্রাস সৃষ্টিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা।

তৃতীয় একটি বিপদের ইঙ্গিতও 'ঘরে বাইরে'তে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। বঙ্গদেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ মুসলমান। আর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বৃহত্তর সংখ্যা হিন্দু। স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুস্বার্থ যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাতে দেশের মুসলমান চাষী, ব্যাপারী,তাঁতী--এই নিম্নবিত্ত সমাজ ক্রমেই আন্দোলন-বিরোধী হয়ে উঠেছিল। আন্দোলনের বিশিষ্ট চরিত্রের কারণে হিন্দুমুসলমানের বিচ্ছেদ ক্রমেই সাম্প্রদায়িক বিরোধের চেহারা নিতে আরম্ভ করছিল।"[১৩] এই বিপদ যে কত ভয়ানক তা আমরা উত্তরোত্তর বুঝে চলেছি, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমরা জানি বঙ্গভঙ্গের উন্মাদনার আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ নিজের মতো করে পল্লী সংগঠনের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন এবং গ্রামের সাধারণ হিন্দু মুসলমানের প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের সঙ্গে, তাদের আত্মপ্রত্যয় উদ্বোধনের চেষ্টার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন। স্বদেশি আন্দোলন যে শহুরে উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্তের আত্মস্বার্থের আন্দোলন, জনসাধারণকে যে এই আন্দোলনে টানার চেষ্টা হয়েছে তাদের হিতের জন্য নয়, তাদের 'ব্যবহার'করার জন্য।এই নিষ্ঠুর সত্যটি ততদিনে রবীন্দ্রনাথ খুব ভালোভাবে বুঝে গিয়েছেন। এই আন্দোলনের বছর দুই পরেই ১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' রচনা শুরু করেছিলেন। এবং বছর দশেক পরে তাঁর অভিজ্ঞতা উপলব্ধি ও বেদনাবোধকে সংহত করে 'ঘরে বাইরে' রচনায় হাত দিয়েছিলেন। 'গোরা' উপন্যাসে

আমরা রবীন্দ্রনাথের যে স্বদেশ ভাবনার সাহ্লাৎ পাই, তারই মধ্যবিত্ত রাজনীতির দিকে পরিস্ফুটতর রূপ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে দেখতে পাই। বলা যায় আমরা আজও সেই মধ্যবিত্ত রাজনীতির মধ্যেই আবদ্ধ।

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বদেশ হল দেশের মানুষ। তাঁর স্বদেশ-সাধনার লহ্ল্য হল গোটা দেশের পরিপূর্ণ উজ্জীবন। এই উজ্জীবন দীর্ঘ নিরলস কর্ম-সাধনার অপেহ্লা রাখে, তা সাময়িক উত্তেজনার ব্যাপার নয়। দেশকে সংগঠিত না করে দেশের সাধারণ মানুষের শুভাশুভের কথা না ভেবে বিলাতি কাপড় পোড়ানোই হোক, স্কুল কলেজ বয়কট করেই হোক, কি আইন আমান্যই হোক, সব শর্টকাট পন্থা।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন এ সবের মধ্যেই একটা চট্‌জলদি সিদ্ধিলাভের লোভ ক্রিয়া করে। তাই তিনি একে সমর্থন করতে পারেন নি। এবং সমর্থন যে করেন নি, উচ্চকণ্ঠে তা জ্ঞাপন করতেও রবীন্দ্রনাথ কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর একাধিক উপন্যাসে কম-বেশি রাজনীতি উপস্থিত। তবুও 'ঘরে বাইরে' যেমন আসলে বিমলার আত্মসন্ধান ও আত্ম-আবিষ্কারের কাহিনি, 'চার অধ্যায়' ও তেমনি সন্ত্রাসের ছোঁয়ায় বিড়ম্বিত এলা ও অতীনের অভিশপ্ত প্রেমকাহিনি, যেখানে এলা-অতীন দুজনেই নিজের ভুল প্রতিজ্ঞার শিকার, ভ্রান্ত আত্মসম্মানের জালে বন্দি।

'যোগাযোগ' উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় বিষয় হল কুমুর বন্ধন। আমাদের সমাজে নারীর বন্ধন সুদূর অতীতে যেমন কঠিন ছিল, এখনো প্রায় সেই রকমই কঠিন আছে। বন্ধনের বেদনা সেকালেও ছিল। কিন্তু বন্ধনের স্বরূপ সম্পর্কে বোধ সেকালে ছিল না। এই বোধটাই একালীন বস্তু। এই বোধ থেকেই নারীমুক্তির দাবি। সমস্ত যোগাযোগ দাঁড়িয়ে আছে এই বন্ধনের বেদনার উপর। সত্যেন্দ্রনাথ রায় 'যোগাযোগ'উপন্যাসটি আলোচনা কালে বলেছেন যে কুমুর প্রথম বন্ধন এইখানে যে সে নারী এবং পড়তি ঘরের বিত্তহীন পরিবারের কন্যা। দ্বিতীয় বন্ধন এই যে স্বামীর সঙ্গে স্বভাবে রুচিতে সংস্কৃতিতে তার ব্যবধান দুস্তর। সে যেমনই স্নিগ্ধ সুকুমার

মার্জিত, দেহমনে লাবণ্যময়ী, তাঁর স্বামী মধুসূদন তেমনি অমার্জিত, রুচিহীন, দাম্ভিক। তার স্বামীর যেমন ধনের গর্ব, তেমনি শক্তির গর্ব। তৃতীয় বন্ধন মধুসূদনের অধিকারবোধের উগ্রতা, স্বামী হিসেবে তার প্রভুত্বের দাবি। এই যথার্থভাবে অসবর্ণ বিবাহ সম্পর্ক, এই হল কুমুর চরম বিড়ম্বনা। কুমু যদি আরো শক্তিমতী, আরো তেজস্বিনী হত, তাহলে তার বন্ধনের চেহারা পাল্টে যেত। অন্যদিকে কুমু যদি মর্যাদাবোধহীনা, ব্যক্তিত্বহীনা একটি ভীরু পল্লীবালিকা হত, তাহলে হয় তার বেদনাবোধে ভাটা পড়ত, না হয় করুণ আত্মঘাতে তার বন্ধনের অবসান ঘটত। কুমুর চতুর্থও শেষ বন্ধন হল কুমুর গর্ভস্থ সন্তান, কুমুর গৃহের ভাবী উত্তরাধিকারী। কুমুর বন্ধন যন্ত্রণা, বন্ধন থেকে তার মুক্তির দ্বিধাগ্রস্ত চেষ্টা, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার বিফলতা– – যদিও বিফলপ্রয়াস তবু আন্তরিক প্রয়াস, এইখানেই নারীমুক্তির অভিযানে 'যোগাযোগে'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং এইখানেই 'যোগাযোগে'র আধুনিকতা।"[১৪]

সমাজ নারীর স্থান নিয়ে, সমাজে ও পরিবারে নারীর আত্মতালাভের বিষয় নিয়ে শরৎচন্দ্রও অনেক লিখেছেন। নারীর প্রতি এক ধরনের ভাবালু শ্রদ্ধা, এক ধরনের গভীর সহানুভূতি, যাকে বলা যায় দরদ, তা শরৎচন্দ্রের সব রচনাতেই উপস্থিত। শুধু নারী নয়, সমাজের যে কোনো বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত মানুষের সম্পর্কেই শরৎচন্দ্রের চিন্তা তাঁর এই দরদের দ্বারা প্রভাবিত। বাংলার পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে আজন্ম ঘনিষ্ট শরৎচন্দ্র বাংলার সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ নিটোল গল্পের ছলে বর্ণনা করেছেন যা অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি নারীকে মহিমান্বিত করেছেন। পল্লীবাংলার সঙ্গে আজন্ম পরিচিত শরৎচন্দ্র তার সহজ সরল রূপ এঁকেছেন। কিন্তু তা আদর্শায়িত। প্রথম থেকেই আমরা দেখতে পাই, শরৎচন্দ্র আমাদের পরম্পরাগত সামাজিক আদর্শের বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই কঠোর সমালোচক। আবার বৈপরীত্যও রয়েছে তাঁর রচনায়। প্রখ্যাত সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন— "যুগসন্ধির ভাবসংকট তাঁর মধ্যেও দ্বন্দ্বের আবহকে গাঢ় করে তুলেছে। তাই সামন্ততান্ত্রিক

রহ্লণশীলতার সঙ্গে ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংঘর্ষে নিজেরই অজ্ঞাতসারে তাঁর পহ্লপাতিত্ব ব্যক্ত হয়ে পড়ে বিলীয়মান গোধূলি দিগন্তের প্রতি। তবু তাঁর সবচেয়ে বড়ো ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য এই যে, নারীপ্রতিমার আদিকল্প দ্বারা বাস্তবের নারীব্যক্তিত্ব বারবার অধিকৃত হলেও তিনি নারীর মূল্য অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন; তাঁর পাঠকৃতিতে, স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও, নিষ্পেষিত নারীর নিজস্ব উচ্চারণ শতজলঝর্ণার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। মোটামুটি তেইশ বছর ব্যাপী সাহিত্যজীবনকে তিনি সার্থকতায় মণ্ডিত করেছেন নিম্নোক্ত ঔপন্যাসিক নির্মিতি দিয়ে: বড়দিদি, পণ্ডিতমশাই, বিরাজবউ, পল্লীসমাজ, অরহ্লণীয়া, চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত, দেনাপাওনা, গৃহদাহ, দত্তা, শেষপ্রশ্ন, বিপ্রদাস ইত্যাদি, নিশ্চয় সর্বত্র সিদ্ধি সমান নয়। তাঁর উপন্যাসিক প্রতিভার কিছু-কিছু সীমাবদ্ধতাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অনেক হ্লেত্রে। তবু তাঁর মতো খাঁটি বাঙালি ঔপন্যাসিক আগে আর দেখা যায় নি।”[১৫]

শরৎচন্দ্রের সঠিক মূল্যায়ন এতে হয়েছে বলে আমরা মনে করি। বস্তুত শরৎচন্দ্রে গ্রাম্য সমাজ অঙ্কিত হলেও গ্রাম্য অর্থনীতির বিশেষ পরিচয় আমরা পাই না। মানবতাবাদী শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রানুসারী লেখক বলে ধরে নেওয়া যায়।

এরপর বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের ধ্বজা নিয়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যের হাত ধরে আবির্ভূত হয়েছিলেন কল্লোলের তরুণেরা। কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল এই ছাত্ররা ফ্রয়েড, ইয়ুং, হ্যাভলক এলিস, এলিয়ট, বোদলেয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য লেখকদের লেখা যেমন পড়েছিলেন তেমনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বদেশি অসহযোগ পর্বের অসাফল্য, চৌরিচোরা কাণ্ড ও গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়া, মন্টেগু চেমসফোর্ডের সংস্কারনীতি, রাওলাট অ্যাক্ট, প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, যৌথ পরিবারের পতন, মধ্যবিত্ত জীবনের চূড়ান্ত সংকট, কর্মহীনতা— এই সবই তারা প্রত্যহ্ল করেছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী আস্তিক্যবাদের বৃত্তে সংবেদনশীল তরুণ প্রজন্ম

নিজেদের দাঁড় করানোর জায়গা পেলেন না। বিশ্বাসের এই সংকটের দিনে, রবীন্দ্রনাথের আশাবাদের বিপরীতে কোথাও তাঁরা থিতু হতে চাইছিলেন। ফলে তাঁদের rational দৃষ্টিভঙ্গি ফ্রয়েড এলিসদের মধ্যে স্থিতি লাভ করেছে। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা কয়লাকুঠি আর খোলার বস্তির জীবন সম্পর্কেও আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। তাই এই যুগের লেখকেরা হীন পতিত, দরিদ্র, আর্থিক ও সামাজিক ভাবে উৎপীড়িত বর্গের দিনযাত্রার ছবি এঁকেছেন। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ প্রধান। সমকালীন লেখক জগদীশ গুপ্ত ও এক শক্তিমান শিল্পী।

প্রেমেন্দ্র মিত্র 'পাঁক' উপন্যাসে বস্তিবাসীদের চিত্র অঙ্কন করেছেন ঠিকই। কিন্তু সেগুলো শুধু চিত্রই হয়েছে বৃহত্তর জীবনের বাস্তব ছবি হয়ে উঠতে পারে নি। রোমান্টিক ভাবের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থেকেছে। বস্তুত কল্লোল যুগের সকল লেখকদের রচনাতেই এই দুর্বলতা রয়েছে। নিম্নবিত্ত, কুলি মজুরদের চিত্র এঁদের সাহিত্যের বিষয় হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেগুলো সমাজ নিরপেহ্ল ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাহিনিই হয়ে রয়েছে।

কল্লোলের লেখকগোষ্ঠী সামাজিক অত্যাচার-অনাচার- বৈষম্যে বিচলিত হয়েছিলেন, কেন অবজ্ঞাত মানুষ সাহিত্যে আসবে না, এই প্রশ্ন তাঁরা উত্থাপন করেছেন। নিম্নশ্রেণির লোকেদের জীবনযাত্রাকে তাঁরা অনুসরণও করেছেন কিন্তু তাঁদের এই উৎসাহে একটা প্রবল রোমান্টিক ঝোঁক ছিল। তাঁর শহরের মজুর কিংবা ভিখিরিপল্লীর মানুষের দিনযাত্রার ছবি এঁকেছেন। গ্রামের জমিদারি শাসন শোষণ, সামন্ত প্রথায় প্রভুদের আধিপত্য ও অধীনতার দ্বন্দ্বকে পাশ্চাত্য লেখকদের অনুসরণকারী এই পাশ্চাত্য শিহ্লায় শিহ্লিত তরুণরা অনুধাবন করতেই পারেন নি। তাই সামন্তবাদী কিংবা ধনতান্ত্রিক কোনো ব্যবস্থায়ই শাসন-শোষণের কৌশলগুলি এই লেখকরা বিশে-ষণ করতে পারেন নি। শুধু একটা প্রবল উৎসাহের তাড়নে কল্লোলের লেখকেরা সাধারণ নিম্ন শ্রেণির দিনযাপনের কয়েকটা খণ্ড চিত্র এঁকেছেন মাত্র।

প্রকৃত পক্ষে নিম্নবর্ণের দিনযাত্রার ছবি কল্লোল গোষ্ঠীর রচনায় natural হয়েই রইলো Real হয়ে উঠলো না।

৩

জগদীশ গুপ্ত সময়ের হিসেবে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের চেয়ে পনেরো ষোল বছরের বড়ো হলেও তাঁর রচনা কল্লোলীয় গোত্রের। শরৎচন্দ্রের নারীর প্রশংসা করলেও তিনিই কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রতিবাদী ভূমিকায় স্থাপন করেন তাঁর চরিত্রকে, শরৎচন্দ্র প্রায়শই যে প্রতিবাদ দেখাতে অপারগ। সতীধর্ম ও নারীত্বের প্রশ্নে শরৎচন্দ্রের লেখকসত্তা যে নারীকে সৃষ্টি করেছে, সে অর্ধেক মানবী, অর্ধেক কল্পনা, কিন্তু জগদীশ গুপ্তর নারী চরিত্র পুরুষতান্ত্রিক প্রতাপের প্রতি প্রবল ঘৃণা প্রকাশ করেছে 'বিধবা রতি মঞ্জরী' গল্পে। জগদীশ গুপ্তের সুখী, সচ্ছল জীবনের প্রতি দৃষ্টি ছিল না, ছিল শঠতা, অপরাধ বঞ্চনা, মিথ্যাচার, নিষ্ঠুরতা— জীবনের এই সব জটিল কূটিল অন্ধকার দিকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। জীবনের কল্যাণময়তায় তিনি আস্থাহীন, মানুষের মহত্ত্বে তাঁর অবিশ্বাস। বরং নিয়তির নিষ্ঠুরতাতেই যেন তাঁর বেশি বিশ্বাস, বঞ্চনা, বেদনা দীর্ঘশ্বাসই তাঁর কাছে মানবভাগ্য। সুখ শুধু ছলনা, আশা শুধু পরিণামের যে-হতাশা তারই কূটিল হাতছানি। মানুষের চারপাশে আছে শুধু আদিগন্ত কুশ্রীতা। তারই মাঝখানে আছে কোনো কোনো দুর্ভাগা মানুষের সৎ হবার মহৎ হবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। যেমন ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছিল 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসের নায়ক সিদ্ধার্থ। সমালোচক জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য—"কবিতায়, নাটকে, গল্প-উপন্যাসে, প্রবন্ধে ভাষণে এবং গানে রবীন্দ্রনাথ বারবার আমাদের শুনিয়েছেন বিশ্বের মৌল মঙ্গলময়তার কথা, জগৎ ও জীবনের মৌন অমৃতত্ত্বের কথা, অমৃতের সন্তান মানুষের ভস্মাচ্ছাদিত মহিমার কথা। জগদীশ গুপ্ত আমাদের শোনালেন দুঃখ-যন্ত্রণার কথা, অশান্তির কথা, দেখিয়ে দিলেন

যে মহিমা মানুষের কোথাও নেই। সবটাই তার ভস্ম, সবটাই কালি।”[১৬]

এই বিপরীত দৃষ্টির কারণেই জগদীশ গুপ্ত রবীন্দ্রোত্তর। এই উল্টো করে দেখার কারণেই তিনি তখনকার কালের আধুনিক। এই বিপরীত দৃষ্টিই তাকে কল্লোল-কালিকলম প্রগতির তরুণ সাহিত্যিকদের কাছাকাছি এনে দিয়েছে। জগদীশ গুপ্তের অবস্থান, অন্তত আধুনিকতার বাবদে, কল্লোলীয় তরুণদের কাছাকাছি বটে, কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে পার্থক্যও রয়েছে।

জগদীশ গুপ্ত ‘অসাধু সিদ্ধার্থ’, ‘লঘু-গুরু’, ‘দুলালের দোলা’, ‘রতিও- বিরতি’, ‘নন্দ আর কৃষ্ণা’ নামে কিছু উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলির প্রধান কথা হল মানবভাগ্য, যার সমগ্র পটভূমি জুড়ে আছে কুশ্রীতা, আছে আপাদমস্তক ইতরতা। জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসের প্রধান কথা হ’ল প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে অন্ধ অদৃশ্য মানব-নিয়তির বিরুদ্ধে মানুষের দুর্বল আর নিষ্ফল চেষ্টা আর পরিশেষে মানুষের সব প্রয়াসের অনিবার্য ব্যর্থতা। এ ব্যর্থতা ট্র্যাজেডির গৌরবের মধ্যে নয়, স্তিমিত ধূসর অভ্যস্ত দৈনন্দিনতায়।

জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে নারীর অসহায় রূপ। গণিকা জীবনের বিড়াম্বনা থেকে মুক্ত হয়ে ‘লঘু গুরুর’ উত্তম ঘর বাঁধতে চায়, নিজেকে নতুন করে স্নেহের মধ্যে, সংসারের কর্ত্রীরূপে পেতে চায়। কিন্তু তার যাবতীয় চেষ্টাকে অসফল করে দেয় সমাজ। ‘দুলালের দোলা’র চক্রবর্তী গিন্নি শূদ্রকন্যা, বাধ্য হয়ে ব্রাহ্মণ ঘরের বধূ হয়। কিন্তু সারাজীবনের সাধনায়ও সে ব্রাহ্মণ হতে পারে না। আবার ‘তাতল সৈকতে’র শরৎ পুরুষের লালসার আর গ্রামীন কুৎসার হাত থেকে রক্ষা পেতে সাতপুরুষের ভিটা ছাড়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুক্তি পায় আত্মহত্যা করে। নারীর এই অপ্রতিষ্ঠা ও পরাভবকে জগদীশ স্থাপন করেনা বর্ণ-বর্গ শ্রেণিবিভাজিত গ্রামসমাজের বাস্তবতায়।

“জগদীশ গুপ্ত অবিমিশ্র খারাপ, আপাদমস্তক ঘৃণ্য মানুষের ছবি এঁকেছেন, সত্যিই

যাদের নরকের কীট বলা যায়। এ যেন পশু মানুষ বা মানুষ পশুর তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের অমৃতের সন্তানের বা ঔপন্যাসিক মানবতত্ত্বের বিপরীত মানবতত্ত্ব মানুষের পশুত্ত্বের তত্ত্ব।"[১৭]

কল্লোল পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায় ১৯২৯ সালে। সেই বছরেই রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা', 'যোগাযোগ', শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' প্রকাশিত হয়। এছাড়া সেই সময় বাংলা সাহিত্যের প্রধান বিষয় বস্তু ছিল নগ্ন বাস্তবতা, আর বে-আব্রু যৌনতা। এসময় 'পথের পাঁচালী' নিয়ে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে হাজির হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'পথের পাঁচলী' শুধু মাত্র উপন্যাসই নয়। এ যেন আমাদের হারানো বাল্যকালকে আমাদের চোখের সামনে এনে উপস্থিত করানো। নিশ্চিন্দিপুরের শান্ত কোমল মমতামাখানো গ্রাম্য প্রকৃতি— সেখানকার বনঝোপ, কালমেঘের জঙ্গল, বনফুল, ঝোলানো ছায়ছন্ন ঝোঁপ, ঝুঁকে পড়া বাঁশঝাড়,ভিজে মাটির গন্ধ, ঝিঁঝির ডাক, দূরে ধলচিতের খেয়াঘাট, পদ্মফুলে ভরা জলাভূমি- এইরূপ চেনা প্রকৃতির স্নেহময় রূপ, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের নীরব সাধারণত্বের, অকিঞ্চন মানুষের নম্র অকিঞ্চনত্বে, ছোট সুখের ছোট দুঃখের নিবিড় মমতা ও করুণ ভালোবাসার রূপকার। আবার 'আরণ্যক' উপন্যাসের নিস্তব্ধ গম্ভীর অচেনা জগতের মহাস্বাতন্ত্র্যেস্থিত অচেনা অরণ্যপ্রকৃতি- ধুসর নাড়া বইহার, দূর দিগন্তে মহালিখরূপে পাহাড়শ্রেণি, জনহীন সরস্বতী হ্রদের জলজ পুষ্পরাজি- উন্মাদিনী ভৈরবীবেশী সন্ধ্যা 'আকাশভরা তারার মালা গলায়— অন্ধকার রজনীতে কালপুরুষের আগুনের খড়গ হাতে দিগ্বিদিক ব্যাপিয়া বিরাট কালীমূর্তি— যেন মৃত্যুরূপা প্রকৃতি, এই কাছের মমতাময়ী আর দূরের মহারহস্যময়ী দুই প্রকৃতিকেই বিভূতিভূষণ আমাদের চেতনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। পায়ের তলায় তৃণাঙ্কুর থেকে দূরদূরান্তের গ্যালাক্সি পেরিয়ে যে বিস্তার এই অন্তহীন আকাশে বিভূতিভূষণ আমাদের চৈতন্যকে বিস্ফারিত করে দিয়েছেন।

বিভূতিভূষণ দারিদ্র্যের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু সে দারিদ্র্যের জ্বালা নেই। তা যেন প্রাকৃতিক

ব্যাপার। তার মধ্যে মানুষের কোনো হাত নেই। এ দারিদ্র্যের যেন কোনো অর্থনৈতিক শিকড় নেই, ঐতিহাসিক কার্যকারণ নেই। এর প্রতিবিধানের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এ দারিদ্র আছে এবং থাকবে। যারা আছে সবার নীচে, সবার পিছে সবহারাদের একজন হয়ে, তাদের প্রতি এই মমতা, তত্ত্বগত সচেতনতা মাত্র নয়। এই মানবিক আত্মীয়তাবোধ একে চিরকালীন বলাই বোধ করি সঙ্গত। শুধু এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে, সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধ্যান- ধারণার ঠুলি চোখ থেকে খুলে না ফেললে চিরকালের পদদলিতদের এই রকম সৌভ্রাতৃত্বের চোখে দেখা যায় না। বিভূতিভূষণ এই চোখে দেখেছেন বলেই তিনি দেশকে দেখতে পেয়েছেন।

আমরা সকলেই জানি যে দারিদ্র্য অহেতুক নয়, তার কারণ আছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে সমাজব্যবস্থার প্রশ্ন, অর্থনৈতিক সমস্যার প্রশ্ন জড়ানো। সমাজের নিচের তলার মানুষেরাই যেখানে প্রধানত দারিদ্র-পীড়িত, শোষিত মানুষেরাই যেখানে দারিদ্রের শিকার, তখন ধনবন্টনের কথা আসে। একইটানে জনসাধারণের সম্পর্কে সচেতনতা এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কথাও এসে পড়ে। বিভূতিভূষণের সমকালের তারশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই এই প্রশ্নের সম্পর্কে প্রখরভাবে সচেতন। এঁরা দুজনেই ইতিহাসকে দেখেছেন সমাজতাত্ত্বিকের চোখ দিয়ে, শ্রেণিদ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে। দুজনেই সামাজিক-অবিচারের বিরোধী, দুজনেরই দৃষ্টি জনজীবনের অভিমুখী। ইংরেজ আগমনের পর এদেশের ভূমি ব্যবস্থার সম্পর্কে, সামাজিক শক্তির এবং শ্রেণিভিত্তিক অর্থনীতির বলক্রিয়া সম্পর্কে তারাশঙ্কর ও মানিক দুজনেই গভীরভাবে আগ্রহী। তাই দুজনের লেখাতেই সমকাল উঠে এসেছে।

৪

১৮৬৫ সালে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে উপন্যাসের উপাদান হিসেবে প্রধানত ইতিহাসকেই আশ্রয় করা হয়েছিল, যে ইতিহাস ধূসর অতীতের। সমকাল

চেতনা, সমকালীন জীবনকথা ও জীবনপট যেখানে উঠে এসেছে, তাও মূলত মধ্যবিত্তের সীমায় বন্দি। রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ ভাবকল্পনা বিশ শতকের প্রথম উপন্যাসেই ঘটনা থেকে চরিত্রের অভিমুখে বাংলা উপন্যাসের আভিযাত্রা সূচিত করেছিলেন। প্রবন্ধ নিবন্ধে সাধারণ মানুষ, গ্রাম্যসমাজ ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর লিখলেও কথাসাহিত্যে বিশেষত উপন্যাসে সমকালের পটে উচ্চবর্গের দ্বন্দ্ব সংঘাতআত্মোপলব্ধি- প্রণয় এই বৃত্তেই ঘোরাফেরা করেছে তাঁর উপন্যাস। বর্ণবিভাজিত গ্রামসমাজের যথাপ্রাপ্ত সামাজিক বাস্তব শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের উপজীব্য হলেও তাঁর ঝোঁক ছিল সামাজিক জীবনের তুলনায় ব্যাক্তিচরিত্রের পবিত্রতা ও মহত্বের দিকে। সমকালীন দেশ-কালের পটে গ্রামজীবন, সাধারণ মানুষকে উপস্থাপন করেছেন কল্লোলের লেখকেরাও। সেখানেও লক্ষ্য করা গেছে প্রকৃতিবাদী ঝোঁক। এর পরবর্তী লেখকেরা মূলত তারাশঙ্কর মানিক ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথনবিশ্বে সমকালীন জীবন তার বিচিত্র অনুপুঙ্খ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় ঔপনিবেশিক শাসনে মধ্যবিত্ত আকাঙ্ক্ষার অবসাদ দেখেছেন। হোসেন মিয়া এসেছে 'মার্কেন্টাইল ক্যাপিটাল' এর ইশারা হিসাবে।[১৮] পদ্মাতীরের ধীবর সমাজের অভিজ্ঞতা বিবৃত হয়েছে দেশকালের পটে। উপন্যাসের অনন্ত তালুকদারও গান্ধীটুপি পরে কংগ্রেসী হয়েছিলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনগণের কাছাকাছি আসতে। 'দর্পণ' উপন্যাসে, সমকালীন কৃষকচেতনার সংগঠিত সংগ্রামী রূপ, 'সহরতলী'তে মিল কেন্দ্রিক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ড বিধৃত। অন্যদিকে তারাশঙ্কর 'গণদেবতা-পঞ্চ গ্রামে' ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় গ্রামীণ ক্ষেত্রে প্রভুত্বের পালাবদল, ধনতন্ত্রের আনাগোনায় সামন্ত সমাজের মধ্যে পরিবর্তনের সম্ভাবনাগুলিকে নানাভাবে ছুঁয়ে গেছেন। বিভূতিভুষণ 'পথের পাঁচালি'তে ঔপনিবেশিক শাসনে গ্রামসমাজের দারিদ্র্য ও ভাঙনের ছবি আকঁলেন। এই সমকালচেতনা নির্দিষ্টভাবে ইতিহাসের এক একটি গুরুত্বপূর্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক প্রতিবেদন গড়ে তোলার দিকে নিয়ে গেল

কথাসাহিত্যিকদের। আসলে চল্লিশের দশকের ঘটনাপ্রবাহ এত প্রত্যহ্ল এবং জনজীবনে মর্মে গভীর সঞ্চারী যে, কোনো ভাবালুতা দিয়ে,আখ্যান রচনার শৈল্পিক নৈর্ব্যক্তিকতা নিয়ে দূরে থাকা আর সংবেদনশীল কথাকারদের পহ্লে সম্ভব হল না। এভাবেই সামাজিক রাস্ট্রীয় ইতিহাসের সাহিত্যিক ডকুমেন্টশান বা উপন্যাসায়ন (Novelisation) ঘটল।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের প্রধান ঘটনাপ্রবাহের প্রতিক্রিয়া বাংলা উপন্যাসে লহ্ল্য করা গেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রমুখের রচনায় '৪২ এর আগস্ট আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিবেশ ইতিহাসসম্মতভাবে উঠে এসেছে। তিন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের উপন্যাসে ৪৩-৪৪ এর মন্বন্তরের মর্মস্পর্শী ছবি এঁকেছেন। ঐতিহাসিক আধিয়ার বিদ্রোহ যা 'তেভাগার লড়াই' নামে পরিচিত, তাও পরোহ্ল ছায়া ফেলেছে অনেক কথাকারের লেখায়। আর দাঙ্গা প্রব্রজন ও উদ্বাস্তু সমস্যা লাঞ্ছিত স্বাধীনতা ও তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে অনেকগুলি উপন্যাস রচিত হয়েছে। আমরা প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েকটি উপন্যাসের নিবিড় পাঠে অবতীর্ণ হব পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে। আপাতত এই প্রাথমিক পর্যবেহ্লণ আমরা রাখতে পারি যে চল্লিশের দশকের ঘটনাপ্রবাহ বাংলা কথাসাহিত্যকে ইতিহাসমুখী করেছে, ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাসের এক নতুন ধরন(genre) গড়ে তুলেছে। পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে উপন্যাস আলোচনাসূত্রে এই প্রাথমিক ধারণা (Hypothesis) কে বিচারের চেষ্টাও থাকবে।

উল্লেখপঞ্জি ঃ-

(১) রায় সত্যেন্দ্রনাথ ঃ "বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ২৮।

(২) দ্রষ্টব্য, বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ ঃ বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ২৩

(৩) রায় সত্যেন্দ্রনাথ ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩৮, দ্রষ্টব্য।

(৪) রবীন্দ্র রচনাবলী ১ম খণ্ড, কলকাতা, ২০১১ পৃ. ৮৭৭।

(৫) ঐ, পৃ. ৮৭৮।

(৬) ঐ, পৃ. ৮৭৯।

(৭) রায় সত্যেন্দ্রনাথ ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

(৮) মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার ঃ বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ২০০৪,পৃ. ১৯।

(৯) ভট্টাচার্য তপোধীর ঃ আধুনিকতা পর্ব থেকে পর্বান্তর, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৫।

(১০) রায় দেবেশ ঃ উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৩১।

(১১) দ্রষ্টব্য, ভট্টাচার্য দেবাশিস ঃ বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা, আগরতলা, ২০১০, পৃ. ১১৫।

(১২) রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৬২৪।

(১৩) রায় সত্যেন্দ্রনাথ ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

(১৪) ঐ, পৃ. ১১২।

(১৫) ভট্টাচার্য তপোধীর ঃ উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ, কলকাতা, ১৪১২, পৃ. ২৪।

(১৬) রায় সত্যেন্দ্রনাথ ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

(১৭) ঐ, পৃ. ১৬৩।

(১৮) বসু অরুণ ঃ মানিক সাহিত্য সমীহ্লা, নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ১০৬।